মু ক্তি যু দ্ধে আ দি বা সী

মুক্তিযুদ্ধের এক অনালোকিত অধ্যায়

সাঁওতালি, গারো, মনিপুরী ও মং। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এক প্রাথমিক হিসেবে জানা যায়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় এক সহস্র। যুদ্ধে শহীদ আদিবাসীর সংখ্যা আনুমানিক অর্ধশত। আদিবাসী এই যোদ্ধা ও তাদের পরিবার বিপন্ন, বিধ্বস্ত। তারা মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত। ক্রমাগত নিগ্রহ, বঞ্চনা ও অস্বীকৃতি তাদের সামাজিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু করে ফেলেছে। গত তিন দশকে এদের অনেকে দেশান্তরিত হয়েছেন... লিখেছেন **আইয়ুব হোসেন**

পাহাড়, অরণ্য, নদী, উপত্যকা বেষ্টিত এই দেশে বিভিন্ন জাতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বর্তমান। অঞ্চল ভেদে বাস করেন ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যালঘু জাতিসত্তা। তাদের রয়েছে আলাদা আলাদা সাংস্কৃতিক উপাদান। আদিবাসী, উপজাতি বা পাহাড়ি বলে পরিচিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষগুলো যেমনি সহজ-সরল তেমনি নির্লোভ প্রকৃতির সাথে মিলেমিশে বসবাস করে বলে প্রকৃতির মতো সারল্য ও উদারতা ওদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিক মনোভাবের চেয়ে সামষ্টিক মনোভাবটাই প্রধান ওদের। ভূমি, পাহাড়, অরণ্যে ব্যক্তিমালিকানা বলে কিছু ছিল না। এসব ছিল সমষ্টিগত সম্পদ। এই সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য থেকে আদিবাসী বা উপজাতীয় এলাকায় জুম চাষ ও জুম কৃষক ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। উৎসবে দলবদ্ধ হয়ে হাতে হাত বেঁধে তারা নাচে। তারপর একত্রে চোয়ানী বা পচানী পান করে সমবেতভাবে উল্লাস করে।

সংস্কৃতি ও অবস্থান দেশের মূলস্রোত থেকে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন হলেও জাতীয় পর্যায়ের ঘটনাবলী থেকে কিন্তু আদিবাসী সম্প্রদায় অবিচ্ছিন্ন বরাবরই। সব জাগরণে, আন্দোলনে তারা অংশগ্রহণ করেছে। ইতিবাচক অবদান সংযোজিত করেছে। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তারা পথ প্রদর্শকের ভূমিকাও পালন করেছে।

বাঙালি জাতির সবচে' বড় অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ। মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র সংগ্রামে শামিল হয়েছেন সবস্ব খুইয়েও। আদিবাসী যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন অথবা দেশত্যাগ করেছিলেন তাদের ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ লুট অথবা ধ্বংস করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর তারা নিজ নিজ এলাকায় ফিরে ভিটে-মাটি ব্যতিরেকে আর কিছু পাননি। পরে আরো পরেও তারা পাননি কিছুই। কোনো সরকারই তাদের খোঁজখবর নেয়নি। তাদের অবদানও এখনো অবধি স্বীকৃত হয়নি। এমনকি মুক্তিযোদ্ধার তালিকায়ও তারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেননি। এ যাবৎ আদিবাসী বা উপজাতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়টিই বিস্ময়করভাবে অনালোকিত, অনালোচিত।

বর্তমান রচনায় আমরা আদিবাসী যোদ্ধাদের বিক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ উপস্থাপনের প্রয়াস পাব। প্রধানত চারটি সম্প্রদায়ের মুক্তিযোদ্ধাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে সংযোজিত হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে— সাঁওতালি, গারো, মনিপুরী ও মং। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকজনও নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। এক প্রাথমিক হিসেবে জানা যায়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় এক সহস্র। যুদ্ধে শহীদ আদিবাসীর সংখ্যা আনুমানিক অর্ধশত। আদিবাসী এই যোদ্ধা ও তাদের পরিবার বিপন্ন, বিধ্বস্ত। তারা মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত। ক্রমাগত নিগ্রহ, বঞ্চনা ও অস্বীকৃতি তাদের সামাজিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু করে ফেলেছে। গত তিন দশকে এদের অনেকে দেশান্তরিত হয়েছেন।

সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধা

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ আমাদের দেশে কিংবদন্তিতুল্য হয়ে আছে। এ দেশের সব জনজাগরণ, উত্থান ও বিদ্রোহে সাঁওতালদের বিভিন্ন সময়ের লড়াই এক অনুপম প্রেরণা যোগায়। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার সাঁওতাল পরগনায় ১৮৫৫ সালে এক অসামান্য ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে সেটা মহাজাগরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সেই বিদ্রোহ পর্বের নেতৃত্বে ছিলেন চার ভ্রাতা— সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব। বিশেষত সিদু-কানু ভ্রাতৃদ্বয় তাদের ত্যাগ, অনমনীয়তা ও অবিচল প্রতিজ্ঞার জন্য বিদ্রোহীদের দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। সরল ও শিক্ষা বঞ্চিত সাঁওতালদের ওপর শোষণ, বঞ্চনা ও পীড়নের ফলশ্রুতিতে সেদিন তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। একই সালের ১০ জুন ৫০ হাজার সাঁওতাল কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। ভূস্বামী, জোতদার, মহাজন ও পুলিশের অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ জানাতে সাঁওতালদের এই কলকাতা যাত্রা। পথিমধ্যে দারোগা-পুলিশ তাদের বাধা দেয়। বিদ্রোহী সাঁওতালরা দারোগাসহ ১৯ জনকে হত্যা করে। অতঃপর কানু ঘোষণা করেন— 'হুলহুল দিশমরে ঢারওয়াক দারোগা বানুক কোওয়া, হাকিম বানুক কোওয়া, সরকার বানুগেয়া। নিতক দ

হড় হপন রেয়াক রাজ হেচে সেটের এনা।' অর্থাৎ বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। চারদিকে শাল গাছের ডাল পাঠাও। এখন দারোগা নেই, হাকিম নেই, সরকার নেই। এবার সাঁওতালদের রাজত্ব এসেছে।

দেড়শ' বছর পর এখনও সাঁওতাল এলাকায় ৩০ জুন সিদু, কানুকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করে সিদু-কানু দিবস পালিত হয়। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর রক্তে-মজ্জায় বিদ্রোহ মিশে আছে। একটি জনপ্রিয় গানে শেষের কয়েকটি চরণ এরকম—

নুড়িচ নাঁড়াড় গাই কাডা, নাচেল লাগিৎ পাচেল লাগিৎ
সেদায় লেকা বেতাবেতেৎ এ্রাম রুওয়াড় নাগিও
তবে দো বেনে হুল গেয়াছো।
এর অর্থ— গো মহিষ, লাঙল, ধন-সম্পত্তির জন্য
পূর্বের মতো আবার ফিরে পাবার জন্য
আমরা বিদ্রোহ করবো।

বিশ শতকের প্রথম দিকে দিনাজপুর, রংপুর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে (নাচোল) সাঁওতাল কৃষকদের তেজোদীপ্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলন বলে পরিচিত এই লড়াই-এ সাঁওতাল বিদ্রোহীদের যে বল ও বীর্য প্রদর্শিত হয়েছে তা অসাধারণ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধেও এই লড়াকু সম্প্রদায়ের অনন্য অংশগ্রহণ ছিল। তারা যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ঐতিহ্যবাহী তীর-ধনুক নিয়ে লড়াই-এর সূচনা করে। কিন্তু আধুনিক মারণাস্ত্রের মুখে তীর-ধনুক নিয়ে টিকে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। অতঃপর রণকৌশল বদলে ভারতে পাড়ি জমায়। সাঁওতাল আদিবাসী নেতা সাগরাম মাঝির উদ্যোগে ও তৎপরতায় শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত সাঁওতাল তরুণরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ভারতের পাতিরাম, মধুপুর, শিলিগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, পানিঘাটা প্রভৃতি এলাকায় অবস্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, জয়পুরহাট, রংপুর ও দিনাজপুরের আদিবাসী সাঁওতাল তরুণরা এসব কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নেন। সাঁওতাল মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা তিন শতাধিক। চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোদাগাড়ি থানার বীর যোদ্ধা বিশ্বনাথ টুডু ছিলেন একজন প্লাটুন কমান্ডার। চাঁপাইনবাবগঞ্জের সীমান্ত এলাকায় বেশ ক'টি সংঘর্ষে তিনি সাফল্যের সাথে নেতৃত্ব দেন। একই থানার সুধীর চন্দ্র মাঝি কয়েকটি সম্মুখ যুদ্ধে অমিত সাহসে লড়াই করেছেন। সম সরেন, চাম্পাই সরেন, ঠাকুর মুরমু, সুশীল সরেন, দাসু মুরমু প্রমুখ আদিবাসী যোদ্ধারা জীবন বাজি রেখে, রক্তে হুল নিয়ে সীমাহীন ত্যাগ ও তেজে লড়াই চালিয়ে গেছেন। নওগাঁর জগদল গ্রামের আদিবাসী তরুণ মাথাই টুডু বিভিন্ন ইয়থ ক্যাম্পে এবং চূড়ান্তভাবে পানিঘাটায় এক মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। চকচান্দাড়ু, বদলগাছি ও পাহাড়পুরে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ লড়াই-এ শামিল হয়েছিলেন মাথাই টুডু।

ফাদার লুকাশ মারান্ডি। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের খ্রিস্ট ধর্মীয় একজন যাজক। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্বে শহীদ মানব সেবক এই পুরোহিতের বাড়ি। নওগাঁ জেলার ধামইরহাট থানার বেনীদুয়ার গ্রামে। সেন্ট ফিলিপস হাই স্কুল ও দিনাজপুর জেলা স্কুলে লেখাপড়া করেন। এরপর তিনি বিহারের রাচি ও কেরালার নেল্লোর সেমিনারিতে উচ্চশিক্ষা নিয়ে খ্রিস্টান পুরোহিত হিসেবে কর্মক্ষেত্র শুরু করেন। একাত্তরে তিনি রুহিয়া মিশনে কর্মরত ছিলেন। একাত্তরে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থ ও খাদ্যের যোগান দিয়েছেন গোপনে। ভারতে পলায়নপর শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছেন ও সহায়তা করেছেন। পাকসেনারা এই খবর পেয়ে ২১ এপ্রিল মিশনে গিয়ে ফাদার লুকাশকে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধে গারো সম্প্রদায়

বাংলাদেশের আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের বাস প্রধানত ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনার সীমান্ত এলাকার পাহাড়গুলোতে। সাধারণভাবে এগুলোকে বলা হয় গারো পাহাড়। গারো অধ্যুষিত সীমান্ত এলাকার তৎকালীন ইপিআর-এর কয়েকটি ঘাঁটি ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর ইপিআররা গারো জনপদে প্রায়শই অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে। ঘরবাড়ি, সহায়-সম্পদ লুটপাট করেছে। এ কারণে গারো সম্প্রদায়ের একটা বৃহৎ অংশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। মেঘালয়, তুরা, নেলুয়াগিরি ও বিজয়পুর ইত্যাদি জেলার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে অসহায় জীবন যাপন করেছে।

এ সময় গারো তরুণদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সংক্ষিপ্ত সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গারোদের এলাকাটি ছিল এগার নম্বর সেক্টরের অধীন। এরা বাঘমারা, তুরা, রংরা, রঙ্গবাগ, তুরাগ এবং ভুটানের পাহাড়ি এলাকায় প্রায় এক মাস অস্ত্র চালনা ও গেরিলা রণকৌশলের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অতঃপর ১১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খানের নেতৃত্বে বিভিন্ন সাব সেক্টরে যোগ দেন। এসব অঞ্চলে সাব সেক্টর কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডার সেকশন কমান্ডার বা কোম্পানি কমান্ডার ছিলেন চুন্নু মিয়া, এস.বাউল, যতীন্দ্র সাংমা, সত্যেন্দ্র হাজং, পৃথ্বিরাজ, আলেক জান্ডার ঘাগ্রা, সুবেদার আদম আলী, ফজলুর রহমান আকনজী, ধীরেন্দ্র রিছিল, ইলিয়াস চৌধুরী, এক্সিবিশন বনোয়ারি, দীপক সাংমা, আবদুল গফুর প্রমুখ। ৬ জন কমান্ডারের নামে ৬টি কোম্পানি (বেশিও হতে পারে) গঠন করা হয়। এগুলো হলো ০১ কোম্পানি, হাফিজ কোম্পানি, দালডা কোম্পানি, ফজলু কোম্পানি, ইলিয়াস কোম্পানি ও দীপক কোম্পানি।

গারো মুক্তিযোদ্ধা যে এলাকা জুড়ে যুদ্ধ করেছেন, অপারেশন চালিয়েছেন সেগুলো যথাক্রমে— কলসিন্দুর, দুর্গাপুর, মনসাপাড়া, ধোবাউড়া, জিকুয়া, ফুলপুর, পূর্বধলা, পুরা-কান্দুলয়া, গোয়াতলা, বাদামবাড়ি, ফরোংপাড়া, নাজিরপুর, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা, দাম্বুক, ভবানীপুর, বিজয়পুর, ধবরাম, টাঙ্গাটি, বেলুয়াগিরি, সান্দা, বারমারী, চন্ডিগড়, বিরিশিরি ও জারিয়া-জাঞ্জাইল।

শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিমল দ্রং একাত্তরের জুন মাসের শেষের দিকে নকলায় একটি ব্রিজ অপারেশনের পর পালাতে গিয়ে রাজাকারদের কাছে ধরা পড়েন। রাজাকাররা তাকে পাক বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। পাক সেনারা তাকে টানা কয়েকদিন অমানুষিক নির্যাতন করে। অবশেষে ফুলপুর থানার কংস নদীর তীরে গুলি করে হত্যা করে। মেধাবী ছাত্র পরিমল দ্রং প্রথমে বিড়ইডাকুরী ক্যাথলিক মিশন স্কুলে এবং পরে বিড়ই ডাকুনী হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। একাত্তরে তিনি এসএসসি পরিক্ষার্থী ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের সংসদ সদস্য কুদরত উল্লাহ মন্ডল এবং বিড়ইডাকুনী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সাবেক সাংসদ হালুয়াঘাট থানার তরুণদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। পরিমল দ্রং এই আহবানে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। মেঘালয়ের তুরা শহরে এক মাসের প্রশিক্ষণ নেবার পর পরিমল ১১ নম্বর সেক্টরে অন্তর্ভুক্ত হন। এই সেক্টরের কোম্পানি কমান্ডার আবদুল গফুরের নেতৃত্বে পরিমল বিভিন্ন গেরিলা অ্যাকশনে অংশ নেন। নকলায় একটি সেতু ধ্বংসের পর প্রয়োজনীয় গোলাবারুদের অভাবে কালিগঞ্জ হয়ে রামনগর গিয়ে পৌছলে সেখানে ধৃত হন। হালুয়াঘাট মধ্যবাজারে তার নামে একটি মার্কেট এবং বিড়ইডাকুনী হাই স্কুলের শহীদ মিনারটি শহীদ পরিমল দ্রং-এর নামে উৎসর্গিত। ময়মনসিংহে 'শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিমল দ্রং টুর্নামেন্ট' নামে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় প্রতিবছর।

১১ নম্বর সেক্টরের দীপক কোম্পানির কোম্পানি কমান্ডার দীপক সাংমা জুলাই মাসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তুরায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর দেশে আসার কিছুকাল পর ১০৬ জন মুক্তিযোদ্ধার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে দীপক কোম্পানি। শত্রুসৈন্য বন্দীসহ বেশ ক'টি সফল অপারেশনে নেতৃত্ব দেন। ১১ জন যোদ্ধার নেতৃত্ব গ্রহণ করে পদাতিক বাহিনীর সেকশন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছেন এক্সিবিশন বনোয়ারি। একাত্তরের ১৫ জুলাই ভোর বেলায় লারাং পাড়া পাক বাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণের মধ্য দিয়ে বনোয়ারির যোদ্ধা জীবনের সূত্রপাত হয়। এরপর নেলুয়াগিরি, টাঙ্গাটি, বিজয়পুর, ভবানীপুর, নলুয়াপাড়া, কান্দা, বারমারী, চন্ডিগড়, দুর্গাপুর প্রভৃতি এলাকায় ২৫টিরও বেশি অপারেশনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। রংনাবাগ ক্যাম্পে ২৯ দিনের প্রশিক্ষণ নেন অরবিন্দ সাংমা। এরপর ফজলু কোম্পানির অধীনে ৩৩ জন গেরিলা যোদ্ধার নেতৃত্ব নিয়ে সহকারী প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে কাজ

করেছেন। ১১টি অপারেশনের ৮টিতে সাফল্য লাভ করেছেন অরবিন্দ সাংমা। এর মধ্যে ক্যাম্প আক্রমণসহ প্রত্যক্ষ যুদ্ধেও অংশ নিয়েছেন। ভরতপুর গ্রামের অনাথ নকরেক আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ইলিয়াস কোম্পানির একজন সাধারণ সৈনিক হয়েও অনাথ কয়েকটি অসাধারণ সফল অপারেশনে অংশ নেন। বারোমারী সীমান্ত সড়কে তিনি সপরিবারে মেঘালয়ের ধাম্বুক শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শিবিরে থাকাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের কথা জানতে পারেন এবং তুরায় গিয়ে প্রশিক্ষণ নেন। কলমাকান্দা ও বিজয়পুরে দুটি দুর্ধর্ষ অপারেশন পরিচালনা করে অনাথদের দল। দুটি অপারেশনেই কয়েকজন পাক সেনা নিহত হয়।

প্লাটুন কমান্ডার ধীরেন্দ্র রিছিলের দলে ছিল ৩৫ জন মুক্তিযোদ্ধা। মে মাসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে এক মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ধীরেন্দ্র রিছিল। জুনের প্রথম সপ্তাহে তার প্রথম অপারেশনের সুযোগ ঘটে। ১২০ জন সহযোদ্ধা নিয়ে তিনি দুর্গাপুর থানার টাঙ্গাটিতে অবস্থিত পাক বাহিনীর এক বড়সড় ক্যাম্প আক্রমণ করেন। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পেছন থেকে তাদের কাভারিং দিয়ে সহায়তা করে। আক্রমণ পরিচালনার পূর্বেই পাকবাহিনী তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে

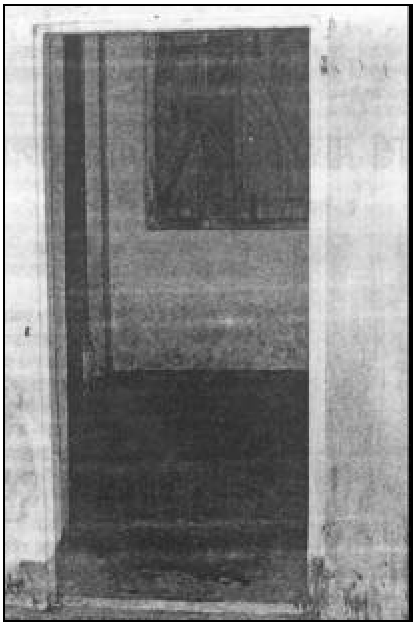

বাথরুমের এই দরজার সামনেই ফাদার লুকাশকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল

অতর্কিতে গুলি শুরু করে। অতঃপর উভয় পক্ষের সম্মুখ যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে উভয় পক্ষ হতাহত হয়। বাবুল নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ও অপর একজন আহত হন। অন্যদিকে ৩৫ জন শত্রুসৈন্য নিহত ও ২৫ জন আহত হয়। নিহত সৈন্যদের লাশ হেলিকপ্টারে ও মহিষের গাড়িতে করে স্থানান্তর করে। মুক্তিযোদ্ধারা ৩টি চায়নিজ রাইফেল ও ২টি স্টেনগান হস্তগত করে। ধীরেন্দ্র ১২টি অপারেশনে অংশ নিয়েছিলেন এবং এর সবগুলোতেই সাফল্য অর্জন করেন।

রংনাবাগ ট্রেনিং ক্যাম্পে এক মাস প্রশিক্ষণ নিয়ে ১১ নম্বর সেক্টরের হাফিজ কোম্পানির একজন সদস্য হয়ে যুদ্ধ করেন স্তেফান নকরেক। পরে যোগ দেন পৃথ্বিরাজ কোম্পানিতে। ৪৫ জন মুক্তিযোদ্ধা প্লাটুনের প্লাটুন কমান্ডার ছিলেন স্তেফান। এর ৩৩ জন উপজাতীয়। এর মধ্যে স্তেফানের এক ভাগ্নে ফিলিক্স নকরেকও ছিল। নাজিরপুর ও কলমাকান্দার দুটো ভয়াবহ অপারেশনে অংশ নেন স্তেফান। এ দুটি যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর অনেকে হতাহত হয়েছিল।

৩ জন গারো মুক্তিযোদ্ধার কথা এ যাবৎ জানা গেছেএ এরা হলেন– পরিমল দ্রং, আরং রিছিল ও অনিল মান্দা।

প্রবাসী সরকারের একটি চিঠি

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীনতাকামী অনেক সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য ত্যাগ করে প্রবাসী সরকারে যোগ দেন। সীমান্ত পাড়ি দিয়ে তারা একে

গারো পাহাড়ের কেন্দ্রীয় ত্রাণ সংস্থা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশকৃত স্মারকলিপি

MEMORANDUM SUBMITTED TO THE PRIME MINISTER OF INDIA BY THE CENTRAL RELIEF COMMITTEE OF GARO HILLS.
SRIMATI INDIRA GANDHI,
Prime Minister of India

Respected Prime Minister,

We, on behalf of the people of the Garo Hills, welcome you on your first visit to the district. Perhaps never before have we looked forward and eagerly awaited your visit to the district as today when your presence among us on this strategic border is so keenly needed and awited.

Together with our brothers and sisters all over the country we share in the legitimate pride and proud hope in your brave and progressive leadership of the country and wholeheartedly pledge our co-operation in your efforts to give our country a new image of strength and social justice to our people. You have again and again demonstrated your genuine concern, friendship and solicitude for the people of this Tegion. We pray that your special care for the people of this area will ever grow.

Today however owing to the aggressive acts of the Army of West Pakistan of oppression and wanton outrage on the unarmed civil population of East Bengal and of naked aggression on our own borders, more recently, a difficult situation has arisen in our district. All along the one hundred and forty four miles of international border, people have been crossing into our district since the start of the Pak army depredations on the 25th March, 1971. The influx is still continuing and to date about two takhs of evacuees have entered into this district, thereby swelling its population of about four lakhs to six.

Coming in the wake of the mass influx of evacuees in 1964 some of whom are still in camps within the district this has imposed a severe strain on the people and the administration owing to the long and tenuous lines of communication.

As it is, the district is almost entirely covered by hills with only small patches of flat land in the border areas, most of which is under cultivation. This committee has been grappling with the problem of finding enough suitable land for pitching tents of putting up temporary shelters for the evacuees.

We belive our Chief Minister, Captain Williamson Sangma, has already apprised your Goverment of the critical situation now prevailing in the district the lack of flat land, the difficult communications posed by a poor road system, the fact that our district is deficit in food requiring a very large part of its normal requirements to be brought form outside, and the occurrence of floods and landslides in the monsoon cutting off communications makes the presence of and evacuee population equal to half the population of the district an immensely difficult problem. We cannot therefore but stress the need to move the bulk of evacuees from the

একে কলকাতার থিয়েটার রোডে অবস্থিত প্রবাসী সরকারের দপ্তরে সমবেত হন। প্রবাসী সরকার তাদের দায়িত্ব বন্টন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে।

প্রবাসী সরকারের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করে আদিবাসী বা উপজাতীয় অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রবাসী সরকারে যোগ দেন। সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তৎকালীন সচিব এইচ.টি.ইমামের সাথেও এমন কয়েক-জন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন যারা একাত্তরের এপ্রিল-মে মাসে সীমান্ত অতিক্রম করে। পার্বত্যবাসীদের মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে পার্বত্য কর্মকর্তাদের সক্রিয় তৎপরতা নিয়োজনের জন্য প্রবাসী সরকার এক পর্যায়ে উদ্যোগ নেয়। এই প্রেক্ষিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব এইচ.টি.ইমাম প্রতিরক্ষা সচিবকে একটি চিঠি লেখেন। গোপনীয় (Secret) সতর্কতা নির্দেশিত এই চিঠিটি লেখা হয় ২৩ অক্টোবর তারিখে।

চিঠির বিবরণ নিম্নরূপ:

SECRET

OCTOBER 23, 1971

A number of my tribal officers and staff crossed the border with me in the months of April/May, 1971. Since then we have been able to utilise the services of only very few of them. There are quite a few available now whose services can be very well utilised in our war effort.

I have always maintained that no move toward Chittagong is possible without the assistance and co-operation of the tribal peple of Chittagong Hill tracts district. Special efforts should, therefore, be made to win the friendship of as many hill people as possible and neutralise those who are hostile. Given this background, I very strongly feel that we should direct our propaganda towords the Hill tribes also.

I came to know the other day that the Ministry of Defence was looking for persons who write scripts in Chakma language. I do not know whether this is in pursuance of the policy recommended by me above. In any case, I would like to emphasise that there are a number of tribal officers and staff who served under me and who can be utilised for this type of work. In case the Secretary, Defence, wants their services, they can be engaged.

(H.T. Imam)
Cabinet Secretary
23.10.71
M.O. No.….
DEFENCE SECRETARY.

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪

একটি স্মারকলিপি

ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল ও শেরপুর এলাকায় বাস করেন গারো জনগোষ্ঠী। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে জীবনের মায়া নিয়ে পাহাড় ও ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে বিপুল সংখ্যক গারো জনতা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নেন। তারা ত্রিপুরার মেঘালয়, তুরাসহ কয়েকটি এলাকায় শরণার্থী শিবিরে ঠাঁই নেন। ত্রিপুরার রাজ্য সরকার গারো শরণার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। শরণার্থী ছাড়াও

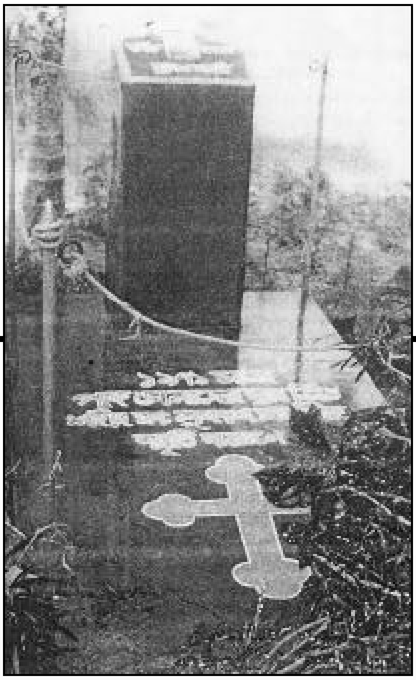

রংহিয়ায় শহীদ ফাদার লুকাশ মারান্ডী স্মরণে স্মৃতিসৌধ

district as the continued temporary stay of such a large number of evacuees has created many social, economic and other problems.

Besides, the influx of so many evacuees into the border areas has brought about great dislocation in the lives of the people living there. To this was added the repeated aggression by the Pak army into our territory forcing our border villagers to flee abandoning their cultivation and other means of livelihood and making them evacuees in their own land. For our unfortunate brothers and sisters who have been uprooted from the border villages we would request the special consideration of your Government for relief and other assistance.

We humbly reiterate our support to your stand on the problem as stated in your speeches on the floor of the Parliament and from public platforms. The evil motives of the rulers of Pakistan has thrown this unwanted burden on every part of India`s body politic to thwart our development by imposing on our limited resources the mass influx of evacuees and the aggressive intrusions on our borders. Wereiterate our support to your efforts to find out a political remedy, your repeated messages to the major powers and your addresses to the conscience of the world.

This is no time to emphasise local issues however important they may be Navertheless taking advantage of your visit, we would like to draw your kind attention to the vital need for strengthening security arrangements along the border as well as ensuring facilities for building up a sound infrastructure for agro-industry in order to accelerate development of this economically backward area which has had to bear the brunt of the consequences of partition in 1947, including stoppage of border trade, repeated influx of evacuees and a dislocation of social and cultural life.

We pary to the Almighty that you may be vouchsafed with long stewardship of our country and that under your leadership it will grow from strength to strength and in peace and prosperity.

JA Jai Hind.

TURA, GARO HILLS, the 12th, June, 1971.

Yours in Service, GROHONSING A. MARK, Deputy Speaker, Maghalaya Legislative, Assembly & Chairman, Central Relief Committee, Tura.

MODY K. MARAK, Chief Executive Member, Garo Hills District Council, Tura.

Singjan D. Sangma, M.L.A., President, Garo Hills, District Congress Committee ® & Vice-Chairman Central Relief Committee,Tura.

ALBINSTONE M. SANGMA, Member of the Executive Committee Garo Hills District Council & Vice Chairman, Central Relief Committee, Tura .

সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র একাদশ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৮

ত্রিপুরায় গারো মুক্তিযোদ্ধারা কয়েকটি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল। গারো শরণার্থী ও মুক্তিযোদ্ধাদের ত্রাণ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তার জন্য রাজ্য কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে একটি স্মারকলিপি দেন। বাংলাদেশের গারো সমাজের সহমর্মী ও একাত্ম ত্রিপুরার গারো নেতৃবৃন্দের এই স্মারকলিপি। সেই সঙ্কটকালে এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ বলেই মনে করা যায়।

মনিপুরী মুক্তিযোদ্ধা

বাংলাদেশের তিনটি জেলায় এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী মনিপুরী সম্প্রদায় বাস করেন। সিলেট বিভাগের মৌলভিবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় মনিপুরীদের বসবাস। জানা যায়, দীর্ঘ আড়াইশ' বছর আগে মনিপুরী সম্প্রদায় এদেশে আসেন এবং বসত গড়ে তোলেন। আত্মমগ্ন ও নির্বিরোধ স্বভাব মনিপুরীদের প্রধান চরিত্র বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় আচারমণ্ডিত সাংস্কৃতিক আবহে মনিপুরীদের জীবনের সমগ্রকাল। ধর্ম ও নৃতাত্ত্বিক কারণে মনিপুরীরা সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে পরিগণিত। এ সঙ্গে এ সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে এক বিভাজন– বিষ্ণুপুরী ও মনিপুরী। উভয় ভাগই মূলধারার মনিপুরী বলে দাবি করে। এসব কারণে সংখ্যালঘু বিষণ্নবোধ মনিপুরীদের আচ্ছন্ন করে রাখে। সংস্কৃতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে মনিপুরী সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য তৎপরতা লক্ষণীয়। মনিপুরী নৃত্য তো কেবল বাংলাদেশ বা উপমহাদেশ নয়, বিশ্বব্যাপীই সমাদৃত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা মনিপুরী নৃত্য দেখে এতো বিমোহিত হয়েছিলেন যে, পরে শান্তিনিকেতনে একজন খ্যাতনামা মনিপুরী নৃত্যশিল্পী রেখে মনিপুরী নৃত্য শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

রাজনীতি সম্পর্কে বরাবরই নিস্পৃহ মনিপুরীরা। প্রত্যক্ষভাবে কেউ রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় এমন একজনকেও এ যাবৎ দেখা যায়নি। তবে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে বেশ কিছু সংখ্যক মনিপুরী যুবক সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। রাজনীতি নির্লিপ্ত এই যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবার পেছনে ছিল দুটো কার্যকারণ। ১. আপন মাতৃভূমির প্রতি আজন্ম ভালোবাসা, ২. হানাদার বাহিনীর কবল থেকে আত্মরক্ষা। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথে কোনো কোনো অঞ্চল থেকে মনিপুরী জনসাধারণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে জীবন বাঁচানোর তাগিদে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। এমন এলাকার মধ্যে রয়েছে সিলেট শহরের মনিপুরী অধ্যুষিত মহল্লা, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট থানাধীন বিলগাঁও অঞ্চল, মৌলভিবাজারের শ্রীমঙ্গল থানাধীন সাতগাঁও অঞ্চল এবং কুলাউড়া থানাধীন বরইতলি অঞ্চল। এছাড়া অবশিষ্ট অন্যান্য অঞ্চলের মনিপুরী জনসাধারণ নানামুখী প্রতিকূলতার মধ্যে দেশেই থেকে যান। আর যারা যোদ্ধা জীবনের পথে পা বাড়াল তারা প্রাত্যহিক শঙ্কা-সঙ্কুলতায় দেশকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞায় রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে ফিরতে লাগলেন। অর্ধাহার-অনাহারে থেকে জীবন বাজি রেখে হানাদার পাক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে থাকলেন। সিলেট শহরের টুকের বাজারে লালার দীঘির পাড়ের নীলমনি সিংহ ননীসহ তাদের দল যে কয়েকটি অপারেশন চালিয়েছিল তা হানাদার বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলো। ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরের অধীনে ননী আরো কয়েকটি অপারেশনে নৈপুণ্য দেখাতে সমর্থ হন। সিলেট মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রেখে এখনো সক্রিয় রয়েছে ননী।

কর্নেল সি আর দত্তের ইকো সেক্টর-৪-এর অধীনে কাজ করেছেন কে. দীলিপ সিংহ। সিলেটের শিবগঞ্জের এই যোদ্ধা সেকশন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। হবিগঞ্জের গোবরখোলা গ্রামের মনমোহন সিংহ অনেকগুলো অপারেশনে অংশ নেন। কালেঙ্গার ডাক সুন্দর অপারেশনে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩ সপ্তাহ চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে সুস্থ হয়ে সেকশন কমান্ডারের দায়িত্বসহ দুধপাতিল আরো কয়েকটি প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এবং তার নেতৃত্বে চুনারুঘাট থানা মুক্ত হয়। মনিপুরী কবি কারাম নীল বাবু সিংহ এবং নীলচান যুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একত্রে থেকেছেন, যুদ্ধও করেছেন। প্রশিক্ষণ সমাপনের পর তারা যুদ্ধে যোগ দেবার সময় ঘোষণা করেছিলেন, অন্তত একজন পাঞ্জাবি সৈন্যকে সরাসরি নিজ হাতে হত্যা না করতে পারা পর্যন্ত ভাতের সাথে তরকারি খাবেন না। বলাবাহুল্য, অচিরেই তাদের প্রতিজ্ঞা পূরণ হয়েছিল। গ্রুপ কমান্ডার এল, হরেন্দ্র সিংহ ডজনখানেক অপারেশনে অংশ নিয়ে একটি যুদ্ধে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। তখন তিনি কিশোর বয়সী। পড়তেন দশম শ্রেণীতে। অন্যদিকে হবিগঞ্জের থোকতোম ভ্রাতৃদ্বয় ছাড়াও আরো অন্তত দশজন মনিপুরী যোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। এরা হলেন– রমন সিংহ, নোংমাইথেম গৌরমোহন সিংহ, খগেন্দ্র সিংহ, থোমদোন সিংহ, কারাম আতেন সিংহ, কুলচন্দ্র সিংহ, এম, নরেন্দ্র সিংহ, গৌরচন্দ্র সিংহ প্রমুখ।

মং যোদ্ধা

পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলা একসময় মং সার্কেলের অধীন একটি দেশীয় স্বশাসিত রাজ্য ছিল। ১ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার জনগোষ্ঠী বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করে। ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলে আন্দোলন। মং সার্কেলের রাজা মপ্রু সেইন এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করেন। পাকিস্তানি শাসকদের রাজা ও মং জনগণের চাপা ক্ষোভ ছিলো দুটো কারণে। ১. ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এই রাজ্যের রাজা বা রানীর ছিল সর্বময় ক্ষমতা। পাকিস্তানি শাসকরা ক্রমশ তাদের ক্ষমতা রহিত করে। ২. কাপ্তাই বাঁধ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের কারণে এই অঞ্চলের বিপুল পরিমাণ আবাদি জমি কাপ্তাই লেকের জলে তলিয়ে যায়। পরে এজন্য সরকার উপর্যুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়নি বা ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন মনে করেনি।

এসব কারণে ক্ষুব্ধ পার্বত্যবাসী পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথমদিকে রাজা মপ্রু'র মানিকছড়িতে অবস্থিত রাজবাড়িটি শহর থেকে পালিয়ে আসা ভীত-সন্ত্রস্ত জনসাধারণের আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। রাজা তার রাজভাণ্ডারের সব সম্পদ আশ্রিতদের অন্ন সংস্থানের জন্য নিয়োজিত করেন। চিকিৎসা সেবার জন্য একটি হাসপাতালও চালু করেন। পার্বত্য নারীরা মানবতার সেবায় এগিয়ে আসেন। আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে শত্রুমুক্ত রাখার জন্য বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর এবং তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে রাজা গড়ে তোলেন প্রতিরক্ষা ব্যূহ। তার নিজের ৩৩টি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র যোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। তার নিজের কার ও কয়েকটি জিপ গাড়িও মুক্তিযোদ্ধার নিকট হস্তান্তর করেন।

একসময় মানিকছড়ির পতন অত্যাসন্ন হয়ে এলে রাজা তার রাজবাড়ি ও মাতৃভূমি পেছনে ফেলে পরিবার ও দলবল নিয়ে ত্রিপুরার সাবরুম শহরে যান। সাবরুম সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় নিরাপত্তার অভাব দেখা দিলে রাজা রূপাইছড়ি শরণার্থী শিবিরে গিয়ে সাধারণ শরণার্থী জীবন যাপন শুরু করে। নিকটবর্তী হরিণা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ চলছিল। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্যূটার এবং অস্ত্র প্রশিক্ষণ থাকার কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে লেগে গেলেন তিনি। এসময় রাজা মপ্রু'র মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার খবর বিবিসিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হয়। তাতে বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ও সংস্থার প্রতিনিধিদের নিকট দেয়া সাক্ষাৎকারে আমাদের মহান মুক্তিযোদ্ধা বিশ্বের সকল বিবেকবান ও স্বাধীনতাকামী মানুষকে সহায়তার জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানান।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জন্য রাজা মপ্রু হয়ে ওঠেন এক বিপজ্জনক ব্যক্তি। তারা রাজাকে হত্যা বা ছিনতাই করার ফন্দি আঁটে। মিজো বিদ্রোহীরা ছিলো রাজা-বিরোধী। পাকিস্তানিরা মিজো বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রে কাজে লাগায়। রাজার অবস্থান বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাকে সপরিবারে আগরতলায় স্থানান্তরিত করে। কিন্তু না, রাজা নিজের নিরাপত্তা নিয়ে বসে থাকেননি। তিনি সংবাদ মাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেবার পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বেশকিছু অপারেশনে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পর

মগ্রু'র আত্মীয় ত্রিপুরার মহারাজা কিরিত বিক্রম তার রাজপ্রাসাদে রাজা মগ্রু'র পরিবারকে আশ্রয় দেন। পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তিনি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করেন। মুক্তি বাহিনীও পরে মিত্র বাহিনীর সাথে একত্রে এক সর্বাত্মক যুদ্ধে জড়িত হন। মিত্রবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনারারি কর্নেল র‍্যাঙ্ক দিয়ে এক ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাথে রাজাকে সম্মুখ সমরে পাঠান। প্রথমে আখাউড়া অপারেশন ও পতন। অতঃপর ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আশুগঞ্জ ও ভৈরব। ভৈরব থেকে রাজা মুগ্রু' মিত্র বাহিনীর সাথে ১৭ ডিসেম্বর শত্রুমুক্ত ঢাকা শহরে প্রবেশ করেন।

বিজয়ের আনন্দ উদ্‌যাপনের পর আগরতলা গিয়ে পরিবার নিয়ে মানিকছড়ি ফেরেন। তখন রাজ বাড়ির সর্বস্ব লুটপাট, বাড়িটিও প্রায় ধ্বংসস্তূপ। ফটিকছড়ি থেকে ভাড়া করা হাঁড়িপাতিল, থালা-বাসনে রাজ-পরিবারের লোকজনদের আহারের বন্দোবস্ত হয়েছিল। সর্বস্ব হারিয়ে রাজা মুগ্রু এক স্বাধীন দেশের পত্তনে অবদান রাখতে পেরেছেন এতেই তার সন্তুষ্টি ছিল। রাজা কোন সরকারের নিকট থেকে কখনো ক্ষতিপূরণ সহায়তা এমনকি স্বীকৃতিও পাননি।

আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা অতুল্য কিছু বৈশিষ্ট্য

ক. একাত্তরে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য দেশপ্রেমের বোধ থেকে দেশের অসংখ্য তরুণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। অনেকে পরিবেশ-পরিস্থিতি অথবা জীবনরক্ষার তাগিদ থেকেও যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তেমনি মুক্তিযুদ্ধ-উত্তরকালে অনেক মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও লালন করে মুক্তিযোদ্ধাই রয়েছেন। আবার অনেকেই একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা হয়েও পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা থাকেননি। অনেকে বলেন, তারা বস্তুত রাজাকারই হয়ে গেছেন। কারণ একাত্তরে রাজাকাররা ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার উপাদান যত্রতন্ত্র প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করেছে যত্রতত্র। সাম্প্রতিকালে ওই একইভাবে একই উপাদান যে মুক্তিযোদ্ধারা ব্যবহার করছেন তারা রাজাকার বই কিছু নয়।

আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের একজনকেও এই জঘন্য প্রক্রিয়ায় শামিলরত বলে দেখা যাবে না। তাদের কপটতা নেই, জটিলতা নেই। আর তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই। ফলে এই সকল নোংরা উপাদান ব্যবহারে তারা অজ্ঞাত, অনভ্যস্ত।

খ. মুক্তিযুদ্ধকালে শান্তি বাহিনী (পিস কমিটি) রাজাকার, আলবদর, আলসামস ইত্যাদি তথাকথিত বাহিনীর উদ্যোক্তা, নেতৃত্ব, সংগঠক ও সদস্য ছিল বাঙালিরা । আদিবাসীদের কেউই এই সকল দেশদ্রোহী বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত হয়নি।

মুক্তিযোদ্ধারা স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সনদপত্র গ্রহণ করেছেন। এটাই সবচেয়ে বড় মর্যাদা ও গর্বমন্ডিত স্মৃতি। অনেকে এই সনদ দেখিয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা আয়ত্ত করেছেন। সনদ বা মুক্তিযোদ্ধা পরিচয়ের বদৌলতে বৈধ-অবৈধ পন্থায় বিপুল অর্থ-বিত্তের মালিকানা অর্জন করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধা আদৌ সনদ গ্রহণ করেননি। অনেকে এ সম্পর্কে জানতেন না।

শহীদ ফাদার লুকাশ মারান্ডী

অনেকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। ফলে যারা সনদ গ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকেই তা হারিয়ে বা নষ্ট করে ফেলেছেন। ময়নসিংহের হালুয়াঘাট থানার প্রায় একশ' আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধার বর্তমানে পেশা হলো দিনমজুরি। এমনকি পরিবারের স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে দিনমজুরি করেছেন বেশির ভাগ। এই এলাকারই একজন মুক্তিযোদ্ধা জীবিকার আর কোনো অবলম্বন না পেয়ে মানুষের দশ দুয়োরে ভিক্ষা করতে শুরু করেন। তিনি কোনো বাড়ির দুয়োরে পৌঁছে খটাস্ করে মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিতেন। একসময় ভিক্ষাবৃত্তি তাকে নিশ্চয়তা দিতে পারেনি বিধায় তিনি দেশান্তর হয়ে চলে গেছেন সেই মেঘালয়ে; যেখানে তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। ওখানে গিয়ে লড়াকু সৈনিকটি কোনো বৃত্তি গ্রহণ করেছেন তা আর জানা যায়নি। এখন আর কারো জানার দরকারও পড়ে না।

সুজিত মারাঙ আরেক আদিবাসী মুক্তি-যোদ্ধা। হালুয়াঘাট এলাকারই, জীবনধারণের জন্য এদেশ। যে দেশ তিনি যুদ্ধ করে সৃষ্টি করেছিলেন, ত্যাগ করতে হয়েছে। মেঘালয়ের পাহাড় বা জঙ্গলে বসে হয়তো স্মৃতি হাতড়ান, সান্ত্বনা খোঁজেন। হিসাব মেলাতে পারেন না। তবে দেশত্যাগের আগে তার মা'র নিকট পবিত্র আমানত অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সনদটি গচ্ছিত রেখে গেছেন। কেবল সুজিত মারাঙই নয় অনেক আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাই দেশান্তরীতে হয়েছেন। মুক্তিযোদ্ধা প্রণব রিছিল বর্তমানে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন 'রাজনীতিবিদরা মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে রাজনীতি করেন। বাস্তবে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কিছুই করে নাই। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধারা বড় অসহায় অবস্থায় আছে। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতেও লজ্জা লাগে।'

পঁচাত্তরে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গারো পাহাড় এলাকায় কাদেরিয়া বাহিনীর যে বিদ্রোহ ও সশস্ত্র অভিযান তাতে মূল শক্তিই ছিল গারো আদিবাসী। এর কারণ মূলত তাদের হতাশা, বঞ্চনা ও আশাভঙ্গের বেদনা। আলবার্ট মানখিন নামে একজন গারো লেখক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন '১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর সীমান্ত এলাকায় যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তা 'কাদেরিয়া' না বলে 'গারো বিদ্রোহ' বলা যায়। এই কাদেরিয়া সংগ্রামের শত শত আদিবাসী যুবক অংশগ্রহণ করেছিল জীবনে না-পাওয়ার হতাশাবোধ থেকেই। এদের অনেকেই ১৯৭১ সালে ছিল নির্ভীক মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধ-পরবর্তীতে তারা সব কিছুই পায়নি— এতটুকু স্বীকৃতি পর্যন্ত মেলেনি। তাই তাদের অন্তরে ছিল প্রচন্ড আক্রোশ। প্রকৃত অর্থে ঐ সময় আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর ছিল না। রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকৃতি ও বঞ্চনাই ছিল মূল ফ্যাক্টর। যে কোন সচেতন ব্যক্তিই বলবেন যে যুগে যুগে বঞ্চনা, অস্বীকৃতি ও শোষণের ফল হিসেবে দেখা দিয়েছে নানা বিদ্রোহ-যুদ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ— তারপর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সাম্প্রতিককালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িয়াদের সংগ্রাম ও শান্তিচুক্তি— এ সমস্তই বঞ্চনা, শোষণ ও অস্বীকৃতির ইতিহাস, নবপ্রেক্ষাপটের সূচনা।'

মোদ্দাকথা, অসততার পরাকাষ্ঠায় নিজেকে খুইয়েছেন একাত্তরের অনেক মুক্তিযোদ্ধাই। পাকিস্তানি দালাল ও রাজাকারদের দলেও গিয়ে ভিড়েছেন অনেকে। পাকিস্তান-প্রীতির মনো-ভাবও পোষণ করেন এখন অনেকে। খেতাব ও তকমাধারী মুক্তিযোদ্ধাও রয়েছেন এর মধ্যে। অথচ আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের একজনও এমন আত্মবিক্রয়ের বাজারের পণ্যে পরিণত হননি। তাদের অসামান্য অবদানের বিনিময়ে তিল পরিমাণ সুবিধা আদায়ের দৌড়ঝাঁপে মত্ত হয়নি। তাদের বোধে এবং তাদের সংস্কৃতিতেই এই উপাদানগুলোই অনুপস্থিত।

সূত্র:

১. মুক্তিযুদ্ধে আমরা, প্রতিবেশী প্রকাশনী ঢাকা ১৯৯৫

২. বাংলাদেশে বিপন্ন আদিবাসী, সঞ্জীব দ্রং নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০১

৩. মং রাজার মুক্তিযুদ্ধ লে. ক. এসআইএম নুরুন্নবী খান বীর বিক্রম, কলম্বিয়া প্রকাশনী

8. Sautal rebellion, Tarapada ray, Subarra yellha, 1988

৫. মৈরা, এ কে সোরাম সম্পাদিত, ১৯৯৬

৬. স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন স্মরণিকা, ১৯৯৬

৭. আদিম, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ১৯৯৮

৮. প্রতিবেশী, ১৯৯৭

৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র ৩য় ও একাদশ খন্ড।

X ফাইল

একাত্তরের বধ্যভূমি

মুক্তিযুদ্ধকে দলীয়করণের চেষ্টা চলেছে সব সময়ই। কখনও কম, কখনও বেশি। প্রকৃত তথ্য, ইতিহাস থেকেছে অপ্রকাশিত। যুদ্ধের ত্রিশ বছর পার হতে চললেও আমরা এখনও জানি না বধ্যভূমির সঠিক সংখ্যা, অবস্থান। অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছে একাত্তরের বধ্যভূমিগুলো... লিখেছেন বদরুদ্দোজা বাবু

মার্চ মাস চলছে। অন্ততপক্ষে ২৬ মার্চ পর্যন্ত আমাদের চারপাশে জোরেশোরে উচ্চারিত হবে মুক্তিযুদ্ধের কথা। শহীদদের আত্মত্যাগের কথা। তারপর আবার চুপসে যাবে। প্রতি-বছরের ইতিহাস এমন কথাই বলে। স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ কথাবার্তায় এ সময় উত্তপ্ত হয় টেলিভিশন ও পত্রিকার পাতা। জাতিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ভাগ করা হয় পক্ষ-বিপক্ষ বলে। বিভ্রান্তিতে পড়ে যায় জনসাধারণ। বুঝতে পারে না স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ শক্তি কারা। কারণ আমাদের হাতে মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক কোনো ইতিহাস নেই। যিনি বা যারা লিখেছেন তারা প্রকৃত ইতিহাসকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ততটা যত্নবান হননি যতটা যত্নবান হয়ে নিজেদের মহিমান্বিত করেছেন। ফলে প্রকৃত ইতিহাস বিবর্জিত হয়ে উঠছে নতুন প্রজন্ম।

সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একাত্তরের বধ্যভূমি কয়টি? এ প্রশ্নের জবাবে গত জানুয়ারি মাসে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জাতীয় সংসদকে জানান, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর হত্যাকান্ডে ১৯৯টি বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মন্ত্রী মহোদয়ের দেয়া এ তথ্যের সত্যতা কতটুকু? মুক্তিযুদ্ধ গবেষকরা অনুমান করেন সারা দেশে কয়েক হাজারেরও বেশি বধ্যভূমি আছে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে ঢাকাসহ সারা দেশে পাঁচ হাজার বধ্যভূমির একটি তালিকাও রয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের বধ্যভূমি চিহ্নিতকরণ জাতীয় কমিটির জানুয়ারি ২০০০ সালে দেয়া তথ্য মতে জানা যায়, এ কমিটি এ পর্যন্ত ৩৬টি জেলায় ৩৪২টি ব্যক্তিমালিকানা-ধীন বধ্যভূমি খুঁজে পেয়েছে। তাহলে মন্ত্রীর কথার সত্যতা কোথায়? এ ক্ষেত্রেও রয়েছে বিভ্রান্তি। স্বাধীনতার ৩০টি বছর অতিক্রম করতে চললেও আমরা এখনও পারিনি সঠিকভাবে বধ্যভূমি-গুলোকে শনাক্ত করতে। যেগুলো শনাক্ত করা হয়েছে সেগুলোর বেশিরভাগই খনন কাজ এখনও হয়নি। অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে সুদীর্ঘ কাল। কিন্তু একাত্তরের এই বধ্যভূমিগুলো হতে পারে মুক্তিযুদ্ধের জ্বলন্ত প্রমাণ। সঠিক ইতিহাস লেখার হাতিয়ার।

এই মসজিদের কনস্ট্রাকশন কাজের সময় আবিষ্কৃত হয়েছে মুসলিম বাজার বধ্যভূমি

১৯৭১ সালের সারা বাংলাদেশের অজস্র বধ্যভূমিগুলোর একটি মুসলিম বাজার বধ্যভূমি। অনাবিষ্কৃত অবস্থায় পড়ে ছিল দীর্ঘ ২৯ বছর। কেউ জানতো না এই বধ্যভূমির কথা কিংবা জানলেও চুপ করে ছিলেন এতকাল। মিরপুর ১২ নম্বর সেকশনের মুসলিম বাজারের ঠিক মাঝখানে নূরী মসজিদের সীমানায় এই বধ্যভূমির অবস্থান। ১৯৯৯ সালের ২৭ জুলাই মসজিদের কনস্ট্রাকশন খোঁড়াখুঁড়ির সময় মাটির নিচের একটি কুয়া থেকে বেরিয়ে আসে মাথার খুলি, গুলিবিদ্ধ হাড়, পরিধেয় বস্ত্রের অবশেষ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তত্ত্বাবধানে কুয়া এবং মসজিদ সংলগ্ন আশপাশের মাটি থেকে পাওয়া গেল মাথার খুলিসহ পাঁচ শতাধিক হাড়গোড়। একাত্তরের শহীদদের পাওয়া এই সব হাড়গোড় যেন প্রমাণ করলো খোঁজা শেষ হয়নি, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও লেখার অনেক বাকি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের সময়

মিরপুর এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় বিবৃত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ সময়কার বিভীষিকাময় ঘটনাবলী। চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল নতুন প্রজন্মসহ সবার মাঝে। খনন কাজের সময় দেখা গিয়েছিল জনতার ভিড়। সবাই দেখতে এসেছিল একাত্তরের স্মৃতিচিহ্ন। বাবার আঙুলে ধরে আসা শিশুটি জানতে চেয়েছিল, বাবা এখানে কি হয়েছিল? বাবার মুখ থেকে তাৎক্ষণিক ইতিহাস শুনে শিশুটি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল কুয়ার দিকে।

মুসলিম বাজার বধ্যভূমিতে পাওয়া অস্থিগুলো আমাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ২৯ বছর আগের প্রেক্ষাপটে। সে সময় লেখালেখিও হয়েছিল বিস্তর। ঐ পর্যন্তই। পিতা জহির রায়হানের অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি অনল রায়হান। মুসলিম বাজার বধ্যভূমির অস্থিগুলো ২৯ বছর পর জহির রায়হানের হারিয়ে যাওয়া রহস্যকে সামনে আনলেও আবারও তা নিরুত্তর থেকে গেল।

মুসলিম বাজার বধ্যভূমি খনন কাজ চলার সময় পরিদর্শনে গিয়েছিলেন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী, আমলা, পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, মুসলিম বাজার বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। এই স্মৃতিস্তম্ভ দেখে মনে একটু হলেও শান্তি পেতে পারবে '৭১-এ আপনজনের লাশ না পাওয়া স্বজনরা। প্রায় দুই বছর হতে চললেও এই স্মৃতিস্তম্ভের বাস্তবায়ন এখনও চোখে দেখেনি জনগণ। মসজিদের সামনে যে বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে সেখানে এখন ফাউন্ডেশন দেয়া মসজিদ উঠে গিয়েছে। ফলে সেখানে এখন আর কোনো ভাবেই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা যাবে না। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও তাদের অবহেলার কারণে আদৌ মুসলিম বাজার বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ হবে কিনা তা নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, যদি আবিষ্কৃত জায়গায় স্তম্ভ না হয়, তাহলে মসজিদের এক পাশে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। কিন্তু সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় একটু তৎপর হলেই মসজিদের সামনের জায়গাতেই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতে পারতো। কারণ মসজিদের পেছনে ও পাশে পর্যাপ্ত জায়গা আছে। মসজিদটি সামনে না বাড়িয়ে পেছনে বাড়াতে পারতো। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর খনন কাজ সম্পন্ন করে চলে আসলে মসজিদ কমিটি পুনরায় মসজিদ বর্ধিতকরণ কাজ শুরু করে। সরকারের পক্ষ থেকে এ কাজ বন্ধ করার জন্য কেউ তাদের সাথে যোগাযোগ করেনি। এমনকি মসজিদ কমিটি এখানে স্মৃতিস্তম্ভ করতে দিতে রাজি নয়। মসজিদ কমিটির সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে মসজিদ কমিটির সভাপতি সিরাজউদ্দিন চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, মসজিদ সীমানায় মুসল্লিরা স্মৃতিস্তম্ভ করতে দিতে

চট্টগ্রামের বধ্যভূমি

চট্টগ্রামের শহর এলাকায় তিনটি বধ্যভূমি পাহাড়তলি, কামানটিলা এবং মধ্যম নাথপাড়া। এর মধ্যে বৃহত্তম বধ্যভূমি হিসাবে পাহাড়তলি... চট্টগ্রাম থেকে লিখেছেন **সুমি খান**

মুক্তিযুদ্ধের পর পাহাড়তলি বধ্যভূমিতে পাওয়া হাড় ও করোটি

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ দেশীয় দোসরদের সহায়তায় সারা দেশে অসংখ্য বধ্যভূমি লাখো বাঙালির শেষ আশ্রয়ে পরিণত হয়। আজ ৩০ বছর পরও বিভিন্ন স্থানে বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হচ্ছে। উদ্ধার হচ্ছে নির্যাতিত মানুষের হাড়গোড় ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নগুলো ধরে রাখার জন্যে দেশের ৮টি বধ্যভূমিতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চট্টগ্রামের শহর এলাকায় তিনটি বধ্যভূমি পাহাড়তলি, কামানটিলা এবং মধ্যম নাথপাড়া। এর মধ্যে বৃহত্তম বধ্যভূমি হিসাবে পাহাড়তলি, বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হবার জন্যে অনুমোদিত হয়েছে। তবে বিভিন্ন রকমের জটিলতা কাটিয়ে এ স্মৃতিসৌধ আদৌ নির্মিত হবে কি-না সেই অনিশ্চয়তায় ভুগছে পর্যবেক্ষক মহল।

পাহাড়তলি বধ্যভূমি

এ ব্যাপারে ব্যক্তিমালিকানাধীন বধ্যভূমিসমূহ অধিগ্রহণের জন্যে গঠিত কমিটির সদস্য প্রজন্ম '৭১ চট্টগ্রাম বিভাগের সভাপতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. গাজী সালেহউদ্দীন এই প্রতিবেদকের কাছে আশাবাদ ব্যক্ত করেন– খুব শীঘ্রই সকল জটিলতা কাটিয়ে পাহাড়তলি বধ্যভূমিতে এমন স্মৃতিসৌধ নির্মিত হবে– যা নতুন প্রজন্মের কাছে এ জাতির আত্মত্যাগ ও '৭১-এর পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের বর্বরতার চিত্র তুলে ধরবে। তবে এই জমিটি অধিগ্রহণে আইনত কোনো বাধা নেই এই মর্মে স্মারক ইস্যু হয় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) চট্টগ্রাম-এর দপ্তর থেকে ৪ মে ২০০০। ৭ ফেব্রুয়ারি '৯৯ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ জমি অধিগ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। এর সবটাই এখনো কাগুজে বলা যায়।

প্রজন্ম '৭১-এর পক্ষ থেকে বধ্যভূমি শনাক্ত করে '৯২তে সাইনবোর্ড লাগানো হয়। কে বা কারা পরবর্তীতে এই সাইনবোর্ড ফেলে দেয়। এই জায়গাটির মালিক ছিলেন নজীর আহমদ চৌধুরী। যার বাড়ি নগরীর মনসুরাবাদে। পাহাড়তলি এলাকায় পাহাড়ের ওপর তার বাংলো বাড়ি ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর কনসেনট্রেশান ক্যাম্প। '৭২-এর জানুয়ারিতে যেখানে অসংখ্য নারীর বিকৃত গলিত লাশ, নির্যাতিতের খুলি, হাড়গোড়, এসিডের বোতল দেখতে পেয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। তেমনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী চট্টগ্রাম সিটি মেয়রের একান্ত সচিব শওকত মোস্তফা। তিনি তখন ৮ম শ্রেণীর ছাত্র।

রেয়াজউদ্দীন বাজারে প্যারামাউন্ট স্টোরের মালিক নজীর আহমদ চৌধুরী বিত্তবান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে এসব বর্বরতায় প্রকাশ্য সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়েছেন। তারই যোগ্য উত্তরসূরি ইউসুফ চৌধুরী। '৯০-এর বাবরী মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে যে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়েছিল– ইউসুফ চৌধুরীর ভূমিকা বিতর্কিত ছিল এ দাঙ্গায় অংশ নিয়েছিলেন বলে। তিনিই '৯৫ সালে বিপণি বিতান বণিক সমিতির বর্তমান সভাপতি আলহাজ আলমগীর আলম-এর কাছে বিক্রি করে দেন। যার বর্তমান মূল্য সেই সময়ের প্রায় ছ' গুণ। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবে কাজ করছে বর্তমান মালিক আলমগীরের মধ্যে। '৯৭তে তিনি পুরো জায়গার ১/২২ ভাগ (৫ কাঠা) জায়গা ১৬ ডিসেম্বর তারিখ বিজয় মেলার মঞ্চে সিটি মেয়র আলহাজ এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর হাতে কাগজপত্র হস্তান্তর করেন। যার কোনো অগ্রগতি এ পর্যন্ত দেখা যায়নি। মেয়রও জায়গাটি বুঝে নেননি। তবে এটা সর্বজনবিদিত '৭১-এ গভীর জঙ্গল ঘেরা এ জায়গাটির 'স্বল্পস্রোতা ছড়া'র অংশটিই 'বধ্যভূমি'র স্মৃতিসৌধের জন্যে দেয়া হয়েছে, যা আদৌ বধ্যভূমি নয়। এ ব্যাপারে আলমগীর আলম এ প্রতিবেদককে বলেন, 'সারা দেশই তো বধ্যভূমি! ৩০ বছর এসব কোথায় ছিল? '৯৭তে ৫ কানি জায়গা মেয়রকে বিজয় মঞ্চে হস্তান্তর করেছি।

চায় না। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানার্থে নূরী মসজিদ পাল্টে মসজিদের নামকরণ করেছি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জামে মসজিদ। এতেই শহীদদের রুহের মাগফেরাত হবে। স্মৃতিস্তম্ভের দরকার কি? এতো গেল মুসলিম বাজার বধ্যভূমির প্রকৃত অবস্থা। সহজেই প্রশ্ন ওঠে, সরকার এ ব্যাপারে কি করছে কিংবা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তাদের দায়িত্বের কতটুকু পালন করেছে?

২০ ডিসেম্বর ১৯৯৮। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটি নির্দেশনামা আসে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে। চিঠিতে প্রধানমন্ত্রী সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে সারা দেশের বধ্যভূমিগুলোকে চিহ্নিত করে অধিগ্রহণ নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। চিঠিতে আরো জানানো হয়, প্রধানমন্ত্রী 'প্রজন্ম '৭১' -এর সাথে আলাপকালে এ সিদ্ধান্ত নেন। পরবর্তীতে গঠন করা হয় বধ্যভূমি চিহ্নিতকরণ জাতীয় কমিটি। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চেয়ারম্যান করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণায় যুক্ত বরেণ্য বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ, প্রকৌশলী ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট করা হয়। সারা দেশে বধ্যভূমি চিহ্নিত করা ছিল এই কমিটির কাজ। এই কমিটির অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় মুসলিম বাজার বধ্যভূমি আবিষ্কারের পর। কমিটির এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সরকার দেশের ছয় বিভাগের বড় কয়েকটি বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করবে। মুসলিম বাজার বধ্যভূমির নাম সেখানে ছিল না। পরবর্তীতে বধ্যভূমি চিহ্নিতকরণ জাতীয় কমিটি

মুসলিম বাজার বধ্যভূমিতে কি শেষ পর্যন্ত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সম্ভব হবে?

২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে এক সভায় সিদ্ধান্ত নেয়, সারা দেশের বধ্যভূমিগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়টি বধ্যভূমির জমি অধিগ্রহণ করে একই আদলে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করবে সরকার। সরকারের বধ্যভূমি সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় জমি অধিগ্রহণ করে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য চিহ্নিত নয়টি বধ্যভূমির মধ্যে মুসলিম বাজার

পতেঙ্গা কামানটিলা বধ্যভূমিতে চলছে খনন কাজ

হয়তো এ বছরই তিনি বুঝে নেবেন। পৌনে ২ একর জায়গা কিনেছি আমি। সরকার বললেই তো আর দেয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজনে আমরা আইনের আশ্রয় নেবো।

পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের সহায়তায় নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে এই এলাকা দেশের বৃহত্তম বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। পাঞ্জাবি লেন (বর্তমান শহীদ লেন) ওয়ার্লেস কলোনির সাধারণ নারী-পুরুষ, নজিরহাট ট্রেনের সাধারণ যাত্রী মসজিদের ভেতর কোরআন পাঠরত ৭০ বছরের বৃদ্ধ– সবাইকে ধরে বেঁধে জল্লাদখানায় জল্লাদদের তলোয়ারের নিচে ধাক্কা মেরে ফেলতো। জবাই করে পেট চিরে ফেলে দিতো এই জায়গায়। এরপর বাঙালিদের হাতে কবর খুঁড়ে সেই কবরে অন্যান্যদের সাথে গোরখোদকদেরও কবর দেয়া হয়েছে। সেই ইতিহাস শহীদ লেনের অসংখ্য পরিবারে আজও জাজ্বল্যমান স্মৃতি। অপেক্ষায় আছে সবাই স্মৃতিসৌধ স্থাপনের মাধ্যমে যথাযথ ইতিহাস তুলে ধরা হবে নতুন প্রজন্মের কাছে।

কামানটিলা বধ্যভূমি

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্মাণ কাজে চাপা পড়ে গেছে কামানটিলা বধ্যভূমি। '৭১-এর মে মাসের শেষ দিকে দক্ষিণ পতেঙ্গার হিন্দুপাড়ায় কিছু লোককে ধরে এনে গর্ত করে তার মধ্যে ফেলে দেয়। আবার কিছু লোককে জলাভূমিতে ফেলে দেয়। তেমনি দুর্ভাগ্যের দুয়ার থেকে ফিরে আসা এক ব্যক্তি অনিল চন্দ্রশীল। যিনি এখনো তার পিতৃপুরুষের দোকান আগলে রেখেছেন। তিনি হাত এবং চোখ বাঁধা অবস্থায় জলায় লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন অনেক পথ পেরিয়ে।

'৯৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে এ বধ্যভূমি শনাক্তকরণ হলেও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করার নির্মাণ কাজে বধ্যভূমির ৬০ বর্গফুট এলাকাও বিমানবন্দর এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। খনন কাজ চলার সময় অসংখ্য মানুষের খুলি, হাড়গোড়, ঘড়ি, কলম, কাপড়-চোপড় উদ্ধার করা হয়। যাচ্ছেতাই খোঁড়াখুঁড়িতে অক্ষত অবস্থায় কোনো হাড়গোড় উদ্ধার সম্ভব হয়নি। কোনো বিশেষজ্ঞকেও ডাকা হয়নি।

ডিসেম্বর '৯৯-এর প্রথম দিকে পানিসম্পদমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী সরেজমিন প্রত্যক্ষ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন স্মৃতিস্তম্ভ অথবা মন্যুমেন্ট নির্মাণের। হা হতোস্মী! সবই আজ আরো অনেক প্রতিশ্রুতির মতো কাগুজে হয়েই রইলো। অ্যাপ্রোচ রোড-এর গোলচক্করে মন্যুমেন্ট বা স্মৃতিফলক করে শহীদদের নামের তালিকা রাখবার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসছে না কেউ। প্রগতিশীল শক্তি ক্ষমতায় থেকেও এমন উদ্যোগের অভাব।

মধ্যম নাথপাড়া বধ্যভূমি

৩১ মার্চ '৭১। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চট্টগ্রামের পথে। দক্ষিণ হালিশহর মধ্যম নাথপাড়ায় অস্থায়ী ইপিআর ক্যাম্প তাদের অভিযানের প্রথম আক্রমণের শিকার। এক সাথে ৪২ জন ইপিআর সদস্য তাদের অতর্কিত আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে নিহত হন। এরপর এলাকার কালীমন্দিরকেন্দ্রিক মধ্যম নাথপাড়ার সব ক'টি হিন্দু পরিবার থেকে নিরীহ বাঙালিদের ধরে এনে তলোয়ার দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। অনতিদূরের মোহাজের কলোনির বিহারিরা নেতৃত্ব দেয় এ হত্যাকাণ্ডে। চট্টগ্রাম এলাকার প্রথম হত্যাকাণ্ডে 'বধ্যভূমি' বলে সম্প্রতি নাথপাড়া চিহ্নিত হয়েছে।

সেবরকারি উদ্যোগে ২০০০ সালের ১৫ ডিসেম্বর খ্যাতিমান শিল্পী ঢালী আল-মামুনের পরিকল্পনায় নির্মিত হয় স্মৃতিসৌধ। গত ৩০ বছরে এ হিন্দুপাড়া মুসলিমপাড়া 'আবদুরপাড়া' হয়ে গেছে। মাত্র অর্ধগন্ডা অবিক্রীত জায়গাতে নির্মিত হয়েছে এ স্মৃতিসৌধ।

'৭১-এ চট্টগ্রাম কলেজের অর্থনীতিতে অনার্সের ছাত্র দীনেশ নাথ ৬ দফার সমর্থনে জোরালো বক্তৃতা দেয়। সেই অপরাধে তাকে হত্যা করে ছয় টুকরো করেছিলো বর্বর পাকিস্তানি সেনা ও তাদের দোসর বিহারিরা। বাসুদেব বৈষ্ণবকে গুলি করে পুকুরে ফেলে কুপিয়ে কাটা হয়। ইপিআর সৈনিকদের আশ্রয় দেয়াই ছিলো নাথপাড়ার নিরীহ বাঙালিদের অপরাধ।

মৃণাল চন্দ্রনাথ তখন স্কুলছাত্র, নিতান্তই কিশোর। তার পরিবারের ছয় সদস্য এক সাথে নিহত হন। তার মা এখনো বার বার অজ্ঞান হয়ে যান সে কথা মনে করে। মৃণাল নাথ এ প্রতিবেদককে বলেন, 'শহীদ পরিবারের স্বীকৃতি দূরে থাক, হিন্দু পরিবার বলেই হয়তো আমরা এখনো এতোটা অবহেলিত।'

দক্ষিণ কাট্টলী, আবদুরপাড়া, মধ্যম নাথপাড়া বধ্যভূমির কাঁচা রাস্তা এবং অবহেলিত এ এলাকাটি প্রশাসনের চরম উদাসীনতাই প্রমাণ করে।

বধ্যভূমিও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া মিরপুরের শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুজ্জোহা হল সংলগ্ন বধ্যভূমি, রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমি বধ্যভূমি, চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ থানার পূর্ব পাহাড়তলী মৌজার বধ্যভূমি, খুলনার চুকনগর বধ্যভূমি, বরিশালের আগৈলঝরা থানার শৈলা ইউনিয়নের পশ্চিম কাঠিলা মৌজার বধ্যভূমি সিলেটের বড় শানা মৌজার বধ্যভূমি, হবিগঞ্জ জেলার ফয়জাবাদ হিল বাহুবল মৌজার বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থপতি ও প্রকৌশলী সমন্বয়ে তিন সদস্যের একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটি স্মৃতিস্তম্ভের নকশার জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্মৃতিস্তম্ভের নকশা অনুমোদন করেন। প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বর, ২০০০এ নকশাটি পাস করেন। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় ডিসেম্বর ২০০০ থেকে জুন ২০০২ পর্যন্ত। বাস্তবায়নের দায়িত্ব পড়ে জাতীয় জাদুঘরের ওপর। জাতীয় জাদুঘর ৬ কোটি ৪৮ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প তৈরি করে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। কিন্ত প্রকল্পটি এখনও পর্যন্ত প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্ল্যানিং কমিশন অনুমোদন দিলে জাতীয় জাদুঘর পিডব্লিউডিকে দিয়ে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজ শুরু করে দেবে বলে জাতীয় জাদুঘরের পক্ষ থেকে ২০০০কে বলা হয়। এ বছর বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পেও এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

কবে নাগাদ এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা তা নিয়ে ইতিমধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা রয়ে গেছে। মুসলিম বাজার বধ্যভূমির কথাই বলা যায়, সরকারের পক্ষে এখন কোনোভাবেই সম্ভব নয় মসজিদ ভেঙে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা। এছাড়াও মসজিদ কমিটি যদি মসজিদ সীমানায় স্মৃতিস্তম্ভ না করতে দেয় সেক্ষেত্রে জাতীয় জাদুঘর কি করবে? এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে জাতীয় জাদুঘর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান ২০০০কে বলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ঠিক করবে কোথায় স্মৃতিস্তম্ভ হবে। আমরা শুধু প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবো। মুসলিম বাজার বধ্যভূমির ক্ষেত্রে ডিসি ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মসজিদ কমিটির সাথে আলাপ-আলোচনা চলছে। উভয়পক্ষ মিলে যে জায়গায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করতে বলবে জাতীয় জাদুঘর সেখানেই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করবে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেও জটিলতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে নীতিমালা কি হবে তাও পরিষ্কার নয়।

দেশের বেশির ভাগ বধ্যভূমিগুলো এখনও পর্যন্ত খনন করা হয়নি। অযত্ন, অবহেলায় এসব বধ্যভূমি পড়ে আছে দীর্ঘকাল। বধ্যভূমিতে শুধু স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করলেই আমাদের দায়িত্ব সম্পন্ন হয় না। প্রয়োজন একাত্তরের শহীদদের নিদর্শন ও দেহাবশেষ উদ্ধার এবং তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। এক্ষেত্রেও জটিলতা রয়েছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, বধ্যভূমি খননের ব্যাপারে তারা কিছু জানে না। শুধুমাত্র বধ্যভূমিগুলোতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করাই সংস্কৃত মন্ত্রণালয়ের কাজ। জাতীয় জাদুঘর যে প্রকল্পের নকশা তৈরি করেছে সেখানে স্তম্ভ, বেদি, রাস্তা, বাগান ইত্যাদি তৈরির পরিকল্পনা থাকলেও নেই খননের পরিকল্পনা। খননের ব্যাপারে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় তাদের কোনো কিছু অবহিত করেনি। তাহলে কি বধ্যভূমিগুলো খনন কাজ সম্পন্ন না করেই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে? যদি খনন কাজ না করে বধ্যভূমির ওপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয় সে ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আর কখনো সঠিকভাবে খনন কাজ সম্পন্ন করা যাবে না। কারণ বধ্যভূমির ওপরে কনস্ট্রাকশনের কাজ হলে সেখানকার দেহাবশেষ কিংবা আলামতগুলো নষ্ট হয়ে যায়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কিছু থাকে না।

মুসলিম বাজার বধ্যভূমির ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হয়েছিল। মসজিদের কনস্ট্রাকশন কাজের জন্য সেখানকার নিদর্শনগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিরপুরের জল্লাদখানা বধ্যভূমি থেকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগতভাবে খননের মাধ্যমে গণহত্যার নিদর্শনগুলো উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। যে দায়িত্বটি পালন করার কথা ছিল সরকারের তা পালন করছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচালক আক্কু চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেশের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত বধ্যভূমিগুলো থেকে দশটি বধ্যভূমি বাছাই করে সেগুলো খননের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সঠিকভাবে খনন কাজ সম্পন্ন হলে সেখান থেকে পাওয়া নিদর্শনগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে আমরা জানতে পারবো কি হয়েছিল সে সময়। এমন নিদর্শনই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যাবে। বধ্যভূমিগুলোর খনন একটি ব্যয়বহুল কাজ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। এজন্য দরকার সরকারি উদ্যোগ। বধ্যভূমিগুলোয় শুধু স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে দিলেই কি সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? এর খনন কাজও গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান সরকারেরও সময়সীমা শেষ হয়ে এসেছে। সামনের নির্বাচনের ডামাডোলের কারণে শেষ পর্যন্ত স্মৃতিস্তম্ভের প্রকল্প আলোর মুখ দেখতে পাবে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

৩০ লক্ষ মানুষের অস্থি মিশে আছে এদেশের মাটিতে। পাকিস্তানি বাহিনী তাদের দোসর রাজাকার, আলবদরদের সহায়তায় যুদ্ধের সঙ্গে চালিয়েছিলো গণহত্যা। যে ক্ষত তারা তৈরি করে দিয়েছিলো জাতি আজও তার লিগেসির ভুক্তভোগী। আমরা এখনও পারিনি সেইসব ঘাতকদের বিচার করতে। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া উচিত— তা না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা কি জবাব দেব? বধ্যভূমিগুলোই পারে যারা গণহত্যার জন্য দায়ী তাদের বিচারের যৌক্তিকতা এবং এই দাবির পক্ষে জনমত আরো প্রবল করতে।

ছবি : কামাল হোসেন

ব ধ্য ভূ মি গু লো র অ ব স্থা ন

বধ্যভূমি চিহ্নিতকরণ জাতীয় কমিটি উল্লিখিত নয়টি বধ্যভূমি ছাড়াও ভবিষ্যতে আরো তিনটি বধ্যভূমিকে প্রকল্পে আনা যেতে পারে বলে সুপারিশ করেছে। এগুলো হলো— ঢাকার মিরপুরের জল্লাদখানা বধ্যভূমি, চট্টগ্রামের বিমানবন্দর সংলগ্ন কামানটিলার বধ্যভূমি এবং কুমিল্লার লাকসামের বধ্যভূমিকে প্রকল্পে আনা যেতে পারে বলে সুপারিশ করেছেন। উল্লিখিত ১২টি ছাড়াও ৩৬টি জেলার ৩৪২টি ব্যক্তিমালিকানাধীন বধ্যভূমি শনাক্ত করেছে বধ্যভূমি চিহ্নিতকরণ জাতীয় কমিটি। এই বধ্যভূমিগুলোর সংখ্যা হলো রাজশাহীতে ১৫, নঁওগায় ১১, লালমনিরহাটে ৬, কুড়িগ্রামে ৯, পঞ্চগড়ে ১, জয়পুরহাটে ১৩, পুটয়াখালীতে ২, বরগুনায় ১১, ফরিদপুরে ১৫, ময়মনসিংহে ৯, কুষ্টিয়ায় ৬, ফেনীতে ২, গোপালগঞ্জে ৩, ঠাকুরগাঁওয়ে ১৮, নবাবগঞ্জে ৮, সিরাজগঞ্জে ১০, সাতক্ষীরায় ২৪, ঢাকায় ৯, কুমিল্লায় ১০, খুলনায় ৯, গাইবান্ধায় ৩০, চট্টগ্রামে ৪, সিলেটে ১০, পাবনায় ২৯, হবিগঞ্জে ৮, জামালপুরে ৪, গাজীপুরে ৪, বরিশালে ১৭, নেত্রকোনায় ২, ভোলায় ১, ঝালকাঠিতে ৮, বাগেরহাটে ৩, দিনাজপুরে ১, শেরপুরে ৬, বগুড়ায় ১২, রাঙ্গামাটিতে ১—এসব ব্যক্তিমালিকাধীন বধ্যভূমি সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নেবে বলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে মিরপুরের জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে খনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে